ঃ যোগাযোগ ঃ
প্রতাপদীঘি লোক বিজ্ঞান সংস্থা, পূর্ব মেদিনীপুর, শোভনলাল সাহু -৯৭৩২৬৮১১০৬, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩।

বিশেষ সংখ্যা
জলসম্পদ ও জলাভূমি বাঁচাও

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা- ৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ-৯৪৩৪৫৭০১৩০

বর্ষ-১১ সংখ্যা - ৪ জুলাই-আগষ্ট/২০১৪ RNI No. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২ টাকা

পুকুর বোজালে কি হয়?

নন্টের সাথে ওর কাকুর জোর তর্ক বেঁধে গেছে। নন্টেকে তোমরা চেনো। নন্টে তোমাদেরই বন্ধু। ক্লাস টেনে পড়ে। পড়াশুনা খেলাধূলা সবেতেই তুখোড়। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে। প্রতিদিনের বিজ্ঞানের ব্যবহার যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। লাইব্রেরিতে ওর রোজকার যাতায়াত। এহেন নন্টে গুরুজন কাকুর

এরপর 4 পাতায়

সঙ্গে তর্ক করবে? ওর কাকু একজন বড় প্রোমোটার। অর্থাৎ যারা বসবাসের জন্য বহুতল বাড়ী নির্মাণ করে বিক্রি করেন। নন্টের কাকুরা শহর ও শহরতলির শত শত পুকুর বা জলাশয় ভরাট করে সেখানে রাতারাতি বহুতল অট্টালিকা নির্মাণ করছেন। আর তাতেই গন্ডগোল, নন্টের যত আপত্তি। আমার সঙ্গে নন্টের দেখা হতে ওকে এই ব্যাপারে খুব উত্তেজিত অবস্থায় পেলাম। আমি বললাম, কেন? পুকুর ভরাট করলে

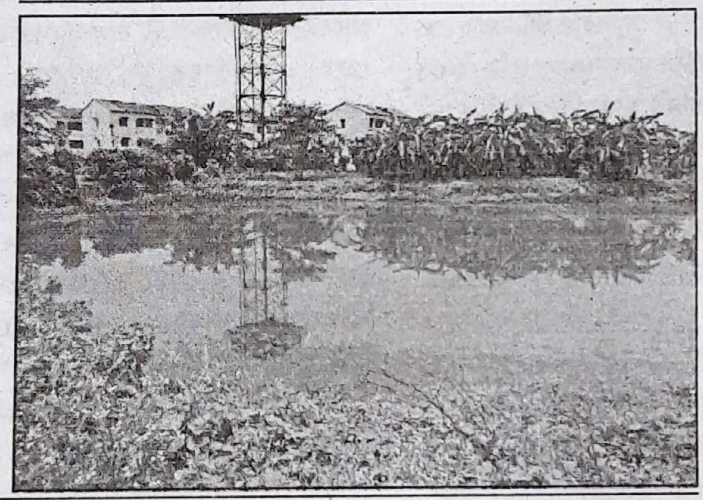

মাটির তলার জল তোলার বিপদ

মাটির তলার জল তোলার বিপদ বিষয়টা উপলব্ধির মধ্যে আসে ষাটের দশকে। তখন আমার বয়স ৫-৬ বছর। আসলে বহু বছর আগে আমার ঠাকুরদা কোলকাতার বড় বাজার থেকে একটা টিউবঅয়েলের বডি আর তিনটে টাটা কেম্পানির ২০ ফুটের পাইপ আর একটা ফিলটার চালের লরির মাথায় চাপিয়ে এনে পুঁতেছিলেন। মিস্ত্রি এসেছিল কোলকাতা থেকে। যাতে ভালো জল পাওয়া যায়, তার জন্য ৫ কেজি দুধ আর বাতাসা দেওয়া হয়েছিল কলের গোড়ায়। যখন প্রথম চাপে, মাটির তলার জল উঠল কি আনন্দ পাড়ার সব মানুষের। সবাই শিশুর মত হাততালি দিয়ে উঠল। আমার ঠাকুরদা সেই সময় বলেছিলেন যাক এখন আর পুকুরের জল খেতে হবে না। আর কলেরা, ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচবে এলাকার মানুষ। এই সবই আমার ঠাকুমার মুখে শোনা।

এরপর 5 পাতায়

জল যখন জীবনরেখা

জল জল করো টুসু
জলে তোমার কে আছে?

এটি একটি গানের কলি মাত্র। যদি 'কে আছে'র বদলে 'কি আছে' বলা হয় তবে জল আর মাত্র থাকে না। অন্য এক মাত্রা পেয়ে যায়। জল তখোন আর হাইড্রোজেন অক্সিজেনের যৌথ সংসার নয়। আরো কিছু। শাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূতের দ্বিতীয় অর্থাৎ 'অপ' বা জল তখন অমৃতরূপী প্রাণে পূর্ণ দেহরক্ষাকারী এবং আরোগ্যের বিশেষ ক্ষমতায় অভিষিক্ত।

পৃথিবীর তিন ভাগই-ই জল, মানব শরীরের ৯২ শতাংশই জলের নির্মাণ, — জল যেহেতু জলের মতই সহজ, তাই জলকে খুব সহজেই অবহেলা করা যায়—দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা কজন-ই বা দিতে পারি আমরা। তাই প্রকৃতির এই শ্রেষ্ঠতম দান জল আজ স্বয়ং সংকটে। আর কান টানলে মাথা এসে

এরপর 2 পাতায়

জলাভূমি সংরক্ষণ ও পুষ্করিণী উন্নয়ন

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা চাকদহ ব্লক ও পৌর অঞ্চলে দীর্ঘদিন মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে।

১৯৯৪ সালে "সাপের কামড়ে মৃত্যু আর নয়।' এই শ্লোগান দিয়ে কাজ শুরু হয় পরে প্রয়াত বিজ্ঞানী ডঃ প্রদোষ রায়ের অনুপ্রেরণায় চাকদহ সহ নদীয়া জেলার পানীয় জলে আর্সেনিক নিয়ে একটি আন্দোলন শুরু হয়। সেই সময় স্কুল অব এনভায়রণমেন্টাল স্টাডিজের ডাইরেক্টর ডঃ দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও চাকদহ হাসপাতালের ডাক্তারবাবু সৌমেন অধিকারীর কথা অনস্বীকার্য। এরা এই আন্দোলনকে সমৃদ্ধকরতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এরপর 6 পাতায়

জল যখন জীবনরেখা

1 পাতার পর

যাওয়ার মতো জলের অপর নাম জীবনও।

জৈব পৃথিবীর যত প্রাণ আছে—উদ্ভিদ কি প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া থেকে যত রকমের মাইক্রোবস সবাই, সব্বাই বেঁচে থাকার জন্য জল নির্ভর। অথচ এই জলেই যখন টান পড়ে, বিশেষ করে যখন এই টানের জন্য মানুষই দায়ী হয়, তখন নিজেই নিজের দিকে ' নৈঃশব্দ্যের তর্জনী' তুলে ধরা ছাড়া উপায় থাকে না। মানুষ নিজেকে যতই জীবশ্রেষ্ঠ ভাবুক, আসলে তা শূণ্যগর্ভ, অনেকটা ঠিক সেই ডালটাই কেটে ফেলা যে ডালে বসে আছেন কবি কালিদাস।

Water Privatisation বা জলের উপর ব্যক্তি মালিকানা নিয়ে কদিন আগেও উত্তাল ছিল ভারতবর্ষ। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় দেখা দিয়েছে জল সংকটের ভয়াবহতা। উপরন্তু গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আছে আর্সেনিকের দৌরাত্ম। কেন এমন হচ্ছে; যেখানে একদা বাংলা ছিল সুজলাং সুফলাং?

আসলে গ্রামের মানুষ ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে তার উৎস শিকড়। হারিয়ে ফেলছে জলের প্রতি তার স্বাভাবিক অধিকার। গত ছয় সাত দশক থেকে বোরো চাষের জন্য গরিব চাষীরা ছোটো ছোটো নদী, নালা, পুকুর বা দীঘির জল পাম্প বা পাইপের সাহায্যে যথেচ্ছভাবে টেনে নেওয়ার ফলশ্রুতিতেই তাদের এখন এই অবস্থা। অবশ্যি বিকল্প কোনো উপায়ও জানা ছিলো না তখন। এছাড়াও উচ্চ ফলনশীল ধান বীজের সঙ্গে যে সার ও কীটনাশক স্প্রে করা হয় সেজন্য দরকার হয়ে পড়ে অনেক অনেক জল। আমরা জানি যে এক একটি ধান গাছের শরীরের শতকরা ৭০ ভাগই হচ্ছে জল। সুতরাং ধান ক্ষেতে যে অফুরন্ত জলের প্রয়োজন তা মেটাতে মঞ্চে চলে আসে প্রযুক্তি যা কখনও শ্যালোর ছদ্মবেশে বা কখনো ডিপ পাম্পের বেশে। এভাবে পাম্প ব্যবহারের অর্থ মাটির তলায় যে জল কোটি কোটি বছর ধরে জমা হয়েছে সেখানেই সরাসরি হাত পড়ে যাওয়া। পৃথিবীর জল ভান্ডার ক্রমশ রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে যাওয়া।

জলের প্রাইভেটাইজেশন (ব্যক্তিগতকরণ) এর সাপেক্ষে একটা ছোটো উদাহরণ দিই। এই যে প্রতিদিন ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীতে কোকাকোলা ধর্মী তথাকথিত কত কত ব্র্যান্ডের ঠান্ডা পানীয় বিপনন হয় তার পেছনে কত শত কোটি লিটার ভূগর্ভের জল যে তুলে আনা হয় তার হিসেব কে রাখে। সধারণ মানুষ ঐ রং মেশানো জল পান করে আপাত আনন্দে আভিজাত্যের ঢেকুর তোলে মাত্র, কখনো তলিয়ে ভাবে না, ঐ ব্যক্তিগত এক বোতল যখন সমষ্টিগত বোতলের রূপ পায় তখন মাতৃপৃথিবীর বুকের নিচে টান পড়ে বৈকি! এর অর্থ ভবিষ্যতে কুয়ো পুকুর এমন কি সাধারণ পাম্পের জলেও টান পড়া।

তথাকথিত ঠান্ডা পানীয় ছাড়াও সেচের ক্যানেলে, বাঁধে আর ভুতল থেকে জল টেনে তোলায় আমাদের জল সম্পদ ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। ফলতঃ নদীতে নদীতে পড়ছে চর, নাব্যতা হারাচ্ছে গঙ্গা, সরস্বতীর বুকে জলের বদলে অবাঞ্ছিত কাশবন। যে নদীর নাম ছিল একদা লাবন্যব্যতি, উত্তর ২৪ পরগণার খড়দহ, সুখচর, রাজারহাট, মধ্যমগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হত তা এখন লুপ্ত — নাম পেয়েছে নোয়াই — নোয়াই খাল। নদী থেকে খাল, খাল থেকে নয়ানজুলিতে রূপ নিতে হয়ত আর বেশিদিন নেই। কিছু মাটি ফেলে, একদিন সেখানে গড়ে উঠবে বাস্তুজমি। উঠবে মৌমাছির কুঠুরির মতো ফ্ল্যাট বাড়ি, জমবে সাইবার কাফে কিংবা শপিং মল। একটা কিনলে যেমন দুটো পাওয়া যায় ফ্রিতে অনেক কিছুই আজকাল সেরকমই বাড়তি হিসেবে আছে দূষণ। দূষণ তো আবার রাবনের মতো দশানন, বহুমুখী।

শুধু কি দূষণ? ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি শূন্য হয়ে গেলে যে মাটির নিচটা ফাঁপা হয়ে যায়, ফাঁকা। ফলে কমবেশি ১৬-৩২ ফুট নেমে যায় জলস্তর। ফলে যখন তখন নেমে আসতে পারে ভূমিকম্পের মতো প্রকৃতির প্রতিশোধ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ক'বছর আগে গুজরাটে যে ভূমিকম্প হয়েছিল তা ঐ শূন্য হয়ে যাওয়া ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলির জন্যই। খোদ আমেরিকার কালিফোর্নিয়াতেও একবার ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়ার ফলে ৫০০০ বর্গমাইল এলাকা সম্পূর্ণ দেবে গেছে, বসে গেছে। মেক্সিকো শহরের আশপাশের কিছু শিল্পাঞ্চলও প্রায় ৩০ ফুট বসে গেছে ঐ একই কারণে। মাটির নিচ ফাঁপা হওয়ার কারণে, আমাদের দেশের রানীগঞ্জ খনি অঞ্চলে, চীনের কয়লাখনি অঞ্চলে প্রায়ই তো ধস নামার খবর পাওয়া যায়। চিলির খনিগর্ভে মাত্র বছর কয়েক আগে যে ধস নেমেছিল তাতে বেশ কিছু খনি শ্রমিকের প্রায় ৭০ দিন বেঁচে থাকার ঘটনা তো প্রায় গল্পগাথার পর্যায়ে চলে গেছে।

আমাদের কলকাতা অবশ্য এখন ' সেফ জোন ' এ আছে। কিন্তু কতদিন থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কেন না গরমকালে এখানকার ভূগর্ভস্থ জলস্তর অনেক নেমে যায়, আবার বর্ষাকালে তার কিছুটা পুনরুদ্ধারও হয়। কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলাধারে প্রবেশ করতে পারে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জল আসে কোথা থেকে? এই জল আসে কল্যাণী, মগরা ও সাঁওতাল পরগণা থেকে। এছাড়াও ভুতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের একটি তথ্য বলছে দুটি জলস্তর কলকাতার ভূগর্ভে জল সরবরাহ করছে একটি হচ্ছে ব্যারাকপুর কল্যাণী জলস্তর, অন্যটি হচ্ছে বারাসাত-বেড়াচাঁপা জলস্তর। এই দুটি স্তর আবার মিশেছে দমদম অঞ্চলে। প্রশ্ন হচ্ছে, এইভাবে কতটা জল আসছে এবং কতটা জল তোলা হচ্ছে তার হিসেব কেউ রাখেন? রাখেন না। কলকাতার মাটির তলায় যদি শূন্যতা বাড়তে থাকে, জনসংখ্যার চাপে কিংবা ক্রমাগত বহুতল নির্মাণের অজুহাতে অথবা ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদা মেটাতে নির্বিচারে জল তুলে, তাহলে কলকাতা হয়ত একদিন এত অট্টালিকার ভার সইতে না পেরে সোজাসুজি মাটির তলায় চলে যাবে। অন্ততঃ এরকম সম্ভাবনার দুর্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?'

তাই আজ শুধু কলকাতা নয়, দেশের অন্যান্য বড়ো বড়ো নগরের বসবাসকারীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার স্বার্থে প্রয়োজন এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো। কেন না 'Prevention is better than cure' পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ নগরীর বহুতল বাড়িঘরগুলির গঠনগত ক্ষমতা (Structural Stability) দেখা উচিৎ বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য এবং ভূগর্ভস্থ জলের স্তরের অবস্থান ও তার প্রেক্ষিতে আর কোনো নূতন বহুতল নির্মাণের অনুমতি দেওয়া যায় কিনা ইত্যাদি।

পৃথিবীতে ফি বছর সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হওয়া ৯৫ হাজার কিউবিক মাইল জলীয় বাষ্প বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। উক্ত জলীয় বাষ্পের ৯০ শতাংশ জল সমুদ্রেই ফিরে যায় বৃষ্টি হয়ে বা বরফ গলে। মাত্র ১০ শতাংশ পৃথিবীর মাটিতে পড়ে। এই ১০ শতাংশের কিছু অংশ বৃষ্টির জল যদি আমরা ধরে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের আর জল সমস্যা থাকবে না।

যে বৃষ্টির জল নদী পথে চলে আসে সেগুলি ধরে রাখার জন্য আমাদের দেশে বাঁধ তৈরি হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য যখন বাঁধের জলস্তর

এরপর ৩ পাতায়

জল যখন জীবনরেখা

2 পাতার পর

বেড়ে যায় তখন বাঁধকে জলের চাপ থেকে বাঁচাতে হঠাৎ করে খুলে দেওয়া হয় বাঁধের স্লুইস গেট। ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে বন্যা। ভেসে যায় গ্রাম ও শহর। অর্থাৎ এই অতিবৃষ্টির জল ধরে রাখবার আমাদের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই জল সংরক্ষণের জন্য 'ক্যাচমেন্ট এরিয়া' বাড়াতে হবে। অথবা জল যে পথ দিয়ে ছাড়া হবে তার পাশে বড়ো বড়ো জলাধার নির্মাণ করতে হবে এবং একটি বিশেষ খাল দিয়ে সংযোগ রাখতে হবে যাতে ঐ অতিরিক্ত জল ঐ খালের মাধ্যমে জলাধারে যেতে পারে। এরকম যত বেশি জলাধার তৈরি করা যাবে তত বেশি জল ধরে রাখা যাবে, ফলে বন্যার আশংকাও থাকবে না ততোটা। এই জলাধারগুলিকে একটার সঙ্গে আরেকটা খাল দিয়ে যুক্ত রাখতে হবে যাতে করে একটা ভর্তি হলে পরবর্তী জলাধারগুলিতে জল নিজে নিজেই ঐ খালের মাধ্যমে চলে যেতে পারে। ঐ জল চাষের জন্য ও পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, এমন কি করা যেতে পারে পরিকল্পিত ভাবে নিবিড় মৎস্য চাষও। মাছে ভাতে বাঙালীর কিছুটা হলেও হতে পারে প্রোটিন চাহিদার নিরসন।

কেবল কৃত্রিম জলাধার নয়, জলাশয় নয়, প্রকৃতির অংশ জলাভূমিরও সংরক্ষণ, এখন জরুরি হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাকৃতিক এই জলাভূমি বলতে আমরা কি বুঝি? ইরানের রামসার কনভেনশনে (১৯৭১) গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে জলাভূমি হচ্ছে সেই সমস্ত স্থায়ী বা অস্থায়ী জলাশয়, বিল, হাওর সায়র খাল, বদ্ধজল বা স্রোতল, স্বচ্ছ বা অনচ্ছ উদ্ভিদপূর্ণ এমন কি কোনো নিম্নভূমি যেখানে সমুদ্রজল জমা হয়ে আছে যার গভীরতা ভাটার সময়ে অনুর্ধ ছয় মিটার। এবংবিধ জলাভূমি তো ভারতবর্ষে অজস্র আছে। অবশ্যি তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত সাতটি জলাভূমি আন্তর্জাতিক 'রামসার সাইট' স্বীকৃতি পেয়েছে। আনন্দের বিষয়, পূর্ব কলকাতার ১২ হাজার হেক্টর জলাভূমিটিও ইতিমধ্যে আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই পরিসংখ্যান প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। উপরন্তু জলে লবণের মাত্রা ক্রমবর্ধমান যা জলজ জীবকূলের অর্থাৎ ফাইটো এবং জুপ্ল্যাংক্টনদের বেঁচে থাকার আশ্রয়।

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার্থে জলাভূমির ভূমিকা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর ক্রম উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে জলাভূমি ঢাল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কেন না জলচক্র বজায় রেখেও জলাভূমি একই সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং মিথেনের ব্যালেন্স রক্ষা করতে সক্ষম। তাই জলাভূমিকে সমীচীন কারণেই কেউ কেউ প্রকৃতির কিডনি বলে থাকেন। এই জলাভূমি বিভিন্ন ধরণের হয়, যেমন মার্শ, সোয়াম্প, পিটল্যান্ডস, ফ্লাডপ্লেনস, ম্যানগ্রোভ, লেক, এস্টুয়ারি লেগুন ও কৃত্রিম জলাভূমি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে একটি জলাভূমিতে যে পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি হয় তা ঐ জলাভূমির ৫ গুণ আয়তনের অরণ্য থেকে প্রাপ্ত অক্সিজেনের সমান। এছাড়াও জলাভূমি শিল্পাঞ্চলের বিষাক্ত গ্যাস সমূহ যথা কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড প্রভৃতি শোষণ করে বায়ুদূষণ কমিয়ে দিতে পারে। জলাভূমি সংরক্ষণ করতে পারলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও আর্সেনিক দূষণ রোধ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীজননের সুষম ভারসাম্য রক্ষিত হতে পারে। আর যেহেতু জলাভূমিগুলি জল ধরে রাখে তাই সেই জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে অবশেষে ভূগর্ভস্থ জলের স্তরকে ঠিক রাখে। আবার এই জলাভূমিগুলিই সন্ধ্যায় ফেলে হিম, সারা বছর শাপলা ফোটায়, জলপোকাদের ঘুম পাড়ায়, পদ্মের মৃণালে পানিফলের স্বাদে আটকে রাখে পরিযায়ী পাখিদের।

তাই যখন আজকাল পুকুর ভরাট করে ব্যাঙের ছাতার মতো গগন চুম্বীর চূড়া দেখি, পায়ের তলার মাটি যেন সরে যায় অজানা আশংকায়। কই শিকাগো শহরের গায়ে গায়ে লেগে থাকা হ্রদগুলি তো মাটি দিয়ে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে না? ভেনিস শহর তো ছোটো বড়ো অজস্র খাল দিয়ে ভরা। গন্ডোলা ভেসে যাচ্ছে। কই ভেনিসবাসী তো খালগুলির মৃত্তিকাসমাধী দিচ্ছে না? আমরাও দেব না, আমাদের স্বার্থেই আমাদের এখন শপথ নেওয়ার সময়। পুকুর বুজিয়ে অট্টালিকা নির্মাণ চলবে না। প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটা সংরক্ষণ করতে হবে আমাদের। মেধা পাটেকরের বিখ্যাত 'Catch the water in catchment' — হয়ে উঠুক আমাদেরও স্লোগান। তাই পরিবেশবিদরা আশায় বুক বাঁধছেন ঃ-

যে নদী হারানো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা...

লেখক ঃ জগন্ময় মজুমদার, ফোন ঃ ৯৪৩২৫২৩৮৯০

কৃতজ্ঞতা ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক বর্তমান, দৈনিক প্রতিদিন, উত্তরবঙ্গ সংবাদ এবং বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম, জয়া মিত্র, ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দেব দে, কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়।

জলের দোষগুণ দূষণমাত্রা

১) pH ঃ জলের অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের সূচককে পি এইচ বলে। বিশুদ্ধজলে pH 7 অর্থাৎ প্রশন। ৭ এর কম হলে অম্লত্ব এবং ৭ এর বেশী হলে ক্ষারত্ব।

২) কঠিন পদার্থ ভাসমান ধুলো-বালি কাদা জলের মধ্যে থাকলে জল ঘোলা দেখায়। কখনও অদ্রাব্য রাসায়নিক পদার্থ জলকে ঘোলা করতে পারে। নির্দিষ্ট পরিমাণ জলকে সূক্ষ্ম ছিদ্রের ছাঁকুনি কাগজে ছেঁকে শুকিয়ে ওজন মেপে নেওয়া হয়। (জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ ২০০ পি পি এম বলতে বোঝায় ১ লিটার জলে ২০০ মিগ্রা কঠিন পদর্থ)।

৩) দ্রবীভূত অক্সিজেন ঃ বায়ুতে অক্সিজেন অল্প পরিমাণে জলে দ্রবীভূত থাকে এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য O_2 বিশেষ প্রয়োজন। 25°C গড় তাপমাত্রায় প্রতি লিটার জলে ৮ মিগ্রা অক্সিজেন থাকে।

৪) পচনশীল জৈব পদার্থ বিশুদ্ধ জলে BOD (Biological Oxygen Demand)-র মান 30 p.p.m. অর্থাৎ ব্যবহার্য জলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থ শোধনের জন্য প্রতি লিটারে ৫ দিনে 30 mg অক্সিজেন প্রয়োজন। BOD মাপতে সাধারণত ৫ দিন লাগে।

৫) রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Chemical Oxygen Dmand) ঃ বিশুদ্ধ জলে BOD -র চেয়ে COD-র মান বেশী হয়। বিভিন্ন জৈব পদার্থকে জল এবং কর্বন ডাই অক্সাইডে জারিত করার জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন তাকেই COD বলা হয়।

জলা ভূমি ভরাট করবেন না।

পৃথিবীর মোট জল ১৪০ কোটি ঘন কিমি। এর মধ্যে ৯৭ ভাগ হল সমুদ্রের লবণাক্ত জল। ২.৩১ ভাগ মেরু প্রদেশের বরফ। ০.৬৯ ভাগ মাত্র ব্যবহার্য।

বৃষ্টির জল ও নদীর জলকে ধরে আবদ্ধ করে কাজে লাগানোই হল জল সম্পদ সমস্যার অন্যতম সমাধান।

পুকুর বোজালে কি হয়?

1 পাতার পর

কি ক্ষতি? ও বলল, ক্ষতি, ক্ষতি, সবটাই ক্ষতি। মানুষের ক্ষতি, জীবেদের ক্ষতি, পরিবেশের ক্ষতি, সবটাই ক্ষতি। আমার বিশ্বাস হল না। বললাম, নন্টে ভাবোতো, কত মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। ফলে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া পুকুর থাকা মানেইতো আশেপাশের লোকজন পুকুর ব্যবহার করে নোংরা করবে। এর থেকে রোগ জীবানুও ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর পুকুর তো একটা জলভর্তি বড়সড় গর্ত ছাড়া কিছুই নয়। ওর অবাক দৃষ্টিতে আমার অজ্ঞানতাই যেন প্রকাশ পেল। বলল, ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রের নাম শুনেছো? ভাবলাম, পুকুরের মধ্যে আবার এসব কি? বললাম, একটু খোলসা করে বলতো?

নন্টেবললো, পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও কোটি কোটি উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে। আছে পারিপার্শ্বিক জড় পরিবেশ। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ করে ক্লার্ক, ওডাম প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জীবদের সঙ্গে ঐ স্থানের জড় উপাদানের আন্তঃ বিক্রিয়ার ফলে যে অনুকূল বসবাসরীতি ও উপযোগী সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে। বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এখানে মানুষ ছাড়াও অন্য সদস্য বা উপাদান রয়েছে যাদের বাদ দিয়ে মানুষ বাঁচাতে পারবে না। যেমনি পুরো পৃথিবীটাই একটা বাস্তুতন্ত্র গঠন করেছে, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ যেমন অরণ্য, সমুদ্র, মরুভূমি, পুকুর, এমনকি এক চিমটে মাটির মধ্যেও পৃথক পৃথক বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয়ে রয়েছে।

নন্টেবললো, তোমার সেই বড়সড় গর্তটাতেই আছে জড় উপাদান যেমন ক্যালসিয়াম এবং নাইট্রোজেন ঘটিত দ্রবীভূত খনিজ লবণ। এছাড়া অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসগুলিতো আছেই। আছে জৈব উপাদান হিউমিক অ্যাসিড এবং ভৌত উপাদান আলো, বায়ু উষ্ণতা। সবগুলিই দরকার। এসবের কাজ নিয়ে প্রশ্ন করার আগেই নন্টে বলল, আছে সজীব উপাদান উৎপাদক। অনেক সময় পুকুরের জলকে যে সবুজাভ দেখায় কারণ ওতে আছে অসংখ্য অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন। এরা প্রতি লিটার জলে লক্ষাধিক থাকে। বড় পুকুরে এর সংখ্যাটা বোঝা একবার। পুকুরের কচুরিপানা, পাতা শ্যাওলা, হাইড্রিলা, পদ্ম ইত্যাদি বৃহদাকার উদ্ভিদও উৎপাদকের মধ্যেই পড়ে। আমি বললাম, 'এদের উৎপাদক বলছ কেন?' বলল, 'এরা একটা বিরাট কাজ করছে যার জন্যে আমরা প্রাণীরা সবাই এদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছি'- সেটা কি? খাদ্য তৈরী। একমাত্র এরাই খনিজ লবণ, জল, দ্রবীভূত গ্যাস ও আলোকে ব্যবহার করে সালোক সংশ্লেষ পদ্ধতির সাহায্যে মহামূল্যবান খাদ্য তৈরী করে। এরাই সমস্ত শক্তির মূল উৎস সূর্যালোককে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধকরে। আবার এই পদ্ধতির ফলে সব জীবের প্রাণবায়ু মূল্যবান অক্সিজেন উৎপন্ন করে। দমে গেলাম, বললাম, 'হুস। তা আর কিছু আছে নাকি?' আছে না। অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক অসংখ্য জুপ্ল্যাঙ্কটন যেমন জলজ পতঙ্গের লার্ভা, ড্যাফনিয়া, সাইক্লপ ইত্যাদি পতঙ্গরা। বললাম, তা থাকলেই বা কি? পরস্পরের সম্পর্ক কি? বলল, আছে আছে। এরাইতো উৎপাদককে খায়। তাই এদের প্রাথমিক খাদক বলে। অন্য খাদকও আছে নাকি? আছে না! ছোট ছোট মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতিতো আবার প্রাথমিক খাদককে খায়। তাই এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদক। আর বাঙালীর খাবার পাতে থাকে যে সব মাছ যেমন বোয়াল, ভেটকি, সাল, সোল প্রভৃতি বড় বড় মাছ তৃতীয় শ্রেণীর খাদক। সঙ্গে সঙ্গে আমি যোগ করলাম কারণ এরা দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদককে খায়। ঠিক। নন্টের উত্তর। বলল, তাহলে দেখা যাচ্ছে সূর্যের যে আলোক শক্তি উৎপাদকের মাধ্যমে পুকুরে এসেছিল তা খাদ্য খাদকের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ক্রমিক পর্যায়ে সমস্ত প্রাণী গোষ্ঠীতে প্রবাহিত হয়েছে। একেই খাদ্যশৃঙ্খল বলে।

আবার অনেকগুলি খাদ্য শৃঙ্খল মিলে বিভিন্ন প্রজাতির জীবের দ্বারা আন্তঃসম্পর্কযুক্ত হয়ে পুকুরে খাদ্য জাল গঠন করে। ততক্ষণে আমার মনে নানা প্রশ্নের উঁকিঝুঁকি। বললাম। এই যে পুকুরে শত শত জীবের উপস্থিতি, এদের মৃত্যু হলে তো পুকুরটা এমনিতেই ভরাট হয়ে যাওয়ার কথা। নন্টের প্রত্যুত্তর, প্রকৃতির রাজ্যে সকলেই সুশৃঙ্খল। এক্ষেত্রে কাজে নেমে পড়ে বিয়োজকরা। অর্থাৎ পুকুরের মাটিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রোটোজোয়া। এরা মৃত জীবকে ভেঙে পুনরায় অজৈব বস্তুতে পরিণত করে। সেই বস্তুগুলিকে আবার উৎপাদক তার খাদ্য তৈরীতে কাজে লাগায়। ফলে পুকুরের প্রকৃতিতে সবসময় থাকে একটা ভারসাম্য যা মানুষের হস্তক্ষেপে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। নন্টের যুক্তির জালে যখন আমি দিশেহারা তখন নন্টে বলল, এটাতো পুকুরের ভিতরের ক্রিয়াকলাপ। এটাই শেষ নয়। জলাভূমি বোজালে মানুষের প্রত্যক্ষভাবে যে যে ক্ষতি হবে সেগুলি হল ঃ—

১) বাতাসে অক্সিজেন কম ও কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমান বেশী হওয়ায় পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। ২) বৃষ্টির জল কোথাও জমতে না পারায় বন্যা দেখা দেবে। লবনহ্রদ বুজে শহর পত্তন কোলকাতার বন্যার একটা প্রধান কারণ। ৩) আমাদের পানীয় ভূগর্ভের জলে আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ইত্যাদি বিষাক্ত পদার্থ থাকে। কিন্তু বিকল্প বিশুদ্ধজল পাব না। ৪) সাঁতারের মাধ্যমে শরীরচর্চা হবে না। ৫) তাজা শাক সব্জী পাব না। ৬) মাছ ডিমের উৎপাদন কমে যাবে। ৭) জল যে বিষাক্ত গ্যাস টেনে নেয় সেগুলি বাতাসে থেকেই যাবে। ৮) প্রকৃতির থেকে দূরে সরে যাওয়ায় মনোরোগী বেড়ে যাবে। নানা রোগের শিকার হবে মানুষ। ৯) বাসস্থানে আগুন লাগলে জল না পাওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়বে। থাক। থাক। নন্টেকে থামাতে বাধ্য হলাম। কারণ ততক্ষণে পুকুর বোজানোর ভয়ংকর বিপদের দিকটা আমার মাথায় এসেছে। বললাম, সরকার কি এসব জানে না? নন্টেবলল, কে বলল জানে না তার জন্য প:ব: ইনল্যান্ডফিসারিজ আইন ১৯৮৪ প:ব: ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৬ ইত্যাদি এবং সম্প্রতি প:ব: জল সম্পদ পরিরক্ষণ, সংরক্ষণ, বিকাশসাধন নামে একটি বিল অনুমোদিত হয়েছে।এগুলির দ্বারা ৫ কাঠা বা তার বেশী মাপের পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধেঅভিযোগ করা যেতে পারে। মন্ত্রী মহাশয়রা বারবার পুকুর বোজানোর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। বললাম কিন্তু এতে শাস্তি হবে কি? অবশ্যই। দোষী সাব্যস্ত হলে এক লাখ টাকা জরিমানা এবং ছয় মাসের জেল অনিবার্য। বললাম কিন্তু এখানে বিঘার পর বিঘা জমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তারা কোন জলাজমিই আর আস্ত রাখবে না। পারলে গঙ্গাটাকেই না ভরাট করে দেয়। নন্টেএই প্রথম আমার সঙ্গে সহমত হল। বলল, মুশকিল কি জান আমার কাকুর সঙ্গে সমাজের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির বন্ধুত্ব আছে। আমিও আজ পর্যন্ত কারুর শাস্তি হয়েছে বলে শুনিনি। এটা কিরকম জান। রহস্য গল্পের শেষে যেমন থাকে। কি হইতে কি হইল মোহন পালাইল। মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগে নন্টের বয়সী এক কিশোরের উক্তি ঃ

'প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস এল। কখন যেন নন্টের উত্তেজনা, হতাশা, রাগ আমার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। চলে আসার পরও যেন নন্টের প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে - কেন বুকভরে প্রাণবায়ু নিতে পারব না? কেন জলে ঝাঁপিয়ে অদ্ভুত সুন্দর ডেফনিয়া, সাইক্লপদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে পারব না? কেন প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি পাব না? কেন? কেন?

লেখক ঃ তাপস মজুমদার, ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬

মাটির তলার জল

1 পাতার পর

কিন্তু বছর পাঁচেক যেতেই কল গেল বিকল হয়ে, কোলকাতার মিস্ত্রি বললো, জলস্তর নেমে গেছে। তাই আরো তিনটে ২০ ফুটের পাইপ লাগবে। আবার কল তোলা হল লাগানো হল ২টি পাইপ। ফিলটারটাও পালটানো হল। আবার বছর চারেক। আবার কল গেলো বিগড়ে। আর টিউবঅয়েলের জল গেলো নেবে। এখন কলটিতে ১২টি পাইপ আর ২টি ফিলটার। গরম কালে জল ওঠে না, বর্ষার সময় অল্প অল্প। পৌরসভার ট্যাপ কল আসার পর থেকেই আমাদের বাড়ির টিউবঅয়েলটি অনেকটা হেরিটেজের মত। কিন্তু এই টিউবঅয়েল পোঁতার পর থেকেই মানুষের জল খাওয়ার অভ্যাস গেছে পাল্টে। খাবার জলের পুকুরটাও গেছে দূষিত হয়ে। এরপরে কল থেকে যখন জল উঠছে না, তখন সবার মুখে যে আতঙ্কের ছবি দেখেছি, আজ তরান্বিত।

আমাদের সংগঠনের বন্ধুরা একটা শ্লোগান দেয়,

ভালো জলের স্বাদ পেয়েছি
খারাপ জল আর খাবো না
সংগঠনের এটাই কথা
এটাই মোদের ভাবনা।

আসলে মাটির তলার জল যে কতখানি মূল্যবান, তা এখনও উপলব্ধির মধ্যে আনতে পারেনি সাধারণ মানুষ। মহাভারতে ভিষ্মের শরশয্যারকাহিনী প্রায় সবার জানা। পিতামহ ভিষ্ম যখন অর্জুনের কাছে তাঁর প্রয়ানের সময় বিশুদ্ধজল পানের আহ্বান রাখেন, তখন অর্জুন মাটিতে বাণ নিক্ষেপ করেন ও মাটির তলার জলের ধারা পিতামহ ভিষ্মের মুখে এসে পড়ে এবং এরপর তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। তখনও জল পানের রীতি ছিল নদীর জল ব সরোবরের জল পান করা।

আমেরিকা সহ পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশে মাটির তলার জল তোলা নিষিদ্ধ। আমাদের দেশেও ভূ-গর্ভস্থ জল পানের সংস্কৃতি ছিল না। নদী এবং পুকুরের জল পান করাই ছিল আমাদের জল পানের ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সেনা ক্যাম্পে টিউবঅয়েল বসিয়ে জল খাওয়ার পদ্ধতি চালু হল। কেননা সেনাদল নদীতে জল পান করতে গেলে শত্রু পক্ষের হামলার শিকার হতে পারে। তাই ক্যাম্পেই তৈরী হল পানীয় জলের উৎস। মাটির তলার জলের অপব্যবহারের সূত্রপাত তখন থেকেই। পশ্চিমবঙ্গ বাদে অন্য রজ্যে মাটির তলার জল তোলার য়ে রীতি তা খুব একটা নেই। বড় ইঁদারা আর বৃষ্টির জল ধরে রাখার একটা কালচার বহু দিনের গুজরাট, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের মানুষদের। আজ বর্তমানে মুম্বাইতে পানীয় জলের মূল উৎস বৃষ্টির জল, তা পরিশোধন করেই মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে মানুষদের কাছে জল পৌঁছে দেয়। টাটানগরের প্রধান পানীয় জলের উৎস ডিমনানালা। সারা টাটানগরে যে বিশুদ্ধপানীয় জল সরবরাহ হয় তা ঐ জলাধার থেকেই আসে। এখানে পাথুরে মাটিতে বরিং করে নলকূপ খনন ব্যয় সাপেক্ষ। তাই ঐ অঞ্চলের আদিবাসী মানুষেরা প্রথম থেকেই জলাধারের জল পান করেন।

কোলকাতা শহরে পানীয় জল প্রধানত হুগলি নদীর জলের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু শতকরা ২০ ভাগ থেকে ২৫ ভাগ জল এখনও ভূ-গর্ভস্থ থেকে তোলা হয়। বিশেষ করে কোলকাতা শহরে যে বড় বড় উপনগরি ও বহুতল তৈরী হচ্ছে সেই নির্মান কার্যে প্রমোটারগণ মাটির তলার জল ব্যবহার করেন। কোলকাতা শহরে ভূ-গর্ভস্থ জল তুলে ফেলার ফলে বহু স্থানে জলস্তর নেমে গেছে। যেমন কোলকাতা মধ্য অঞ্চল (বিবাদিবাগ, এসপ্ল্যানেড, পার্কস্ট্রিট, লোয়ার সার্কুলার রোড ও পার্কসার্কাস) বিগত ৪০ বছরে ৮-১০ মিটার জলস্তর নেমে গেছে। এখন ১৫০-২০০ মিটারের নিচে মিষ্টি জল পাওয়া সম্ভব। সেইরূপ দক্ষিণ অঞ্চলে অর্থাৎ গড়িয়াহাট, রাসবিহারি, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, টালিগঞ্জ ও বেহালা অঞ্চলে যে সুস্বাদু ও সুন্দর ভূ-গর্ভস্থ জল ছিল তা আজ আর নেই। ঐ অঞ্চলগুলিতে একই জলস্তরে কোথাও মিষ্টি জল বা লবনাক্ত জল পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে এই অঞ্চলে জনবসতি ও জনঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার ভূতল জলের ব্যবহারও বেড়ে গেছে অনেকখানি। ফলে জল তল ৫-১০ মিটারের বেশি নেমে গেছে। এছাড়া দক্ষিণ কোলকাতা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত বহু বড় বড় জলাশয় এবং নয়ানজুলি বন্ধকরে গড়ে উঠেছে।

উপনগরি, শপিংমল, ফিল্মসিটি। অনুমোদন নেওয়ার তোয়াক্কাও করেন না এরা। কোথাও কোথাও পঞ্চায়েত পৌরসভার অনুমতি আদায় করে নিয়েছেন এরা বড় বড় পিচের রাস্তা তৈরী হচ্ছে, রাস্তার পাশের নয়নজুলিগুলো আজ বন্ধ। ফুটপাত না রেখে, গাছ না লাগিয়ে উন্নয়ন চলছে। পাড়ায় পাড়ায় বস্তি উন্নয়নের টাকা দিয়ে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার অলিগলি কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে মাটির তলায় আর বৃষ্টির জল প্রবেশ করছে ন। ড্রেন দিয়ে সোজা গঙ্গা বা নদীতে পড়ছে জল। যা সমুদ্রের নোনা জলকে স্ফিত করছে। এবং জলস্তরের নোনা জলের প্রবেশ ঘটছে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনায় বোরো ধানের চাষের ফলেও প্রচুর মাটির তলার জল তুলে ফেলা হচ্ছে। সাবমার্সেবাল পাম্প দিয়ে। ও চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এছাড়া পানীয় জল এখন পন্য। পাড়ার কেলো ভুলো থেকে পঞ্চায়েত পৌরসভা সবাই মাটির তলার জল তুলে বিক্রি করতে ব্যস্ত। বড় বড় প্লাস্টিকের ডাববা করে বাড়িতে বাড়িতে মাসিক ৩০০ টাকায় পানীয় জল বলে যে জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তা আদৌও কি পানীয়? এই জল পানীয় জল কিনা তা পরীক্ষা করার মত সরকারের কোনো পরিকাঠামো নেই। এছাড়া জেনে রাখা ভালো সরকারী ভাবেই আপনার পায়ের তলার ভূ-গর্ভস্থ জল কিছুদিনের মধ্যেই দেশি ও বিদেশি বহুজাতিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বিশ্বব্যাঙ্কও আই এম এফ জল বেসরকারীকরণের জন্য প্রায় সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে ফেলেছে। প্রকৃতি লুটের মত লুঠ হয়ে যাবে মাটির তলার জল। তাই একটি পরিসংখ্যানের মধ্যে দিয়েই তা প্রমাণিত হয়ে যাবে।

জল লুটের মূল নায়ক কোকোকোলা কোম্পানিকে কে চেনেন না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। আপনার পরিবারের জলের ঘড়া, কলসি, ঘটি আর গ্লাসকে কখন ওরা ট্রাঙ্কে পুরে দিয়েছে তা আপনি ভাবতেও পারেননি। এখন জল খাওয়া হয় বোতলে। ১৯৯১ সালে বোতল জলের চাহিদা ছিল ২০ লক্ষ পেটি। ২০০৪-২০০৫ সালে তার বার্ষিক চাহিদা দাঁড়ায় ১৫০০ লক্ষ পেটি। ভারতে সরকারি নির্দেশনামা মেনে বোতল কারখানার পরিমাণ ৪০০০ এর ওপর। তাদের মধ্যে তামিলনাড়ুতে প্রায় ১৫০০ বোতল কারখানা। প্রতিদিন গড়ে এই বোতল কারখানায় ২ লক্ষেরও বেশি বোতল তৈরি হয়। সুতরাং মাটির তলার জল তোলার পরিমাণ কিভাবে বৃদ্ধিপাচ্ছে তা এই পরিসংখ্যান

এরপর ৪ পাতায়

জলা ভূমি সংরক্ষণ ও পুষ্করিণী উন্নয়ন

1 পাতার পর

কিন্তু সেই সময় আমাদের মাথায় আসে আর্সেনিক এর মূল কারণ মাটির তলার জল তুলে ফেলা কিন্তু রি-চার্জ হচ্ছে কোথায়? সব জল তো ড্রেন দিয়ে গঙ্গায় গিয়ে সমুদ্রের নোনা জল বৃদ্ধি করছে। এছাড়া চাকদহের বিখ্যাত পুকুরগুলো ভরাট করে বিক্রি করার এক মহাযজ্ঞ চলছে। এই পুকুর ভরাটের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা এলাকার বড় সমাজবিরোধী বলে পরিচিত। সাথে রাজনৈতিক দলের মদত রয়েছে। তা আরো ভালো করে বুঝতে পারা যায় যখন ভিআইপি রোডের পাশে এয়রপোর্ট থেকে উল্টোডাঙ্গার রাস্তার পশের নয়ানজুলি ও জলাভূমি ভরাট হচ্ছে। আমরা অনেকগুলি বিজ্ঞান সংগঠন মিলে একটি স্মারকলিপি দিই তৎকলীন মুখ্যমন্ত্রীকে। তখন ঐ অঞ্চলের প্রভাবশালী মন্ত্রী প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী বলেছিলেন, 'এই চ্যাংড়া ছেলেমেয়েরা, আর কোন কাজ নেই তেমাদের? বেশি জলভূমি থাকলে বেশি সর্দি-কার্শি রোগ হবে। তাই পেদ্দার গ্রুপদের এইসব জলাভূমি দেওয়া হচ্ছে। ওরা আবাসন বানাবে এটাই উন্নয়ন বুঝলে?'

৫ই জুন ২০১২ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সভায় ঘোষণা করেছেন 'জলাশয় বন্ধ করে প্রোমোটিং করতে দেব না। সবুজ না বাঁচলে, জলাভূমি না বাঁচলে প্রাণের আশা থাকবে না।' এছাড়া বর্তমান রাজ্য সরকার নতুন পুকুর কাটা ও পুকুর সংস্কারের পক্ষে। আশার কথা এই কাজ করতে আগ্রহী প্রশাসন, তার নজির মিলল চুয়াডাঙা অঞ্চলের একটি পুকুরকে ভর্তি করে দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মাটি তুলে আবার জলাশয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। চাকদহের মূল জল নিস্কাশন নালা 'হেড়ের খাল' ঐ অঞ্চলের পঞ্চায়েতের একজন আধিকারিক ও গ্রামের মানুষের প্রচেষ্টার প্রায় ৫০ শতাংশ সংস্কার সম্ভব হয়েছে। আমরা চাই চাকদহের প্রবীন ও পুরাতন মানুষেরা অত্যন্ত বুদ্ধির সাথে যেসব জলাশয়গুলি খনন করে সযত্নে লালন করে রেখেছিলেন তা আবার সেই অবস্থায় ফিরে আসুক।

সামনে গরমকাল চাকদহের পূর্বাঞ্চলে টিউবওয়েল দিয়ে প্রতি বছরই জল ওঠে না। তাই প্রচন্ড জলকষ্টে ভোগেন কে বি এম, লালপুর, গৌড়পাড়া, দাসরায়পাড়া ও পাবনা কলোনির বাসিন্দাগন। এবছর অর্থাৎ ২০১৪-র মার্চ মাস থেকেই এ পাড়ের ৮নং ওয়ার্ডে জলকষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছে। চাকদহের ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর যে নিম্নমুখী তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে। এরপর প্রচুর পরিমাণে জল তুলে বড় বড় প্লাস্টিকের ডাববায় বিক্রি করা হচ্ছে যা কোনটাই আইনসম্মত নয়। 'সুইড'-এর অনুমতি ব্যতীত এই কাজ করা উচিত নয়। তাই জলাশয়গুলি সত্বর খনন খুব জরুরী। আবর্জনা ফেলে যেসব জলাশয় বন্ধ করা হচ্ছে তাও বন্ধ করতে হবে।

আমরা সমস্ত কাজটা করতে পারব এইরকম ভাবনা নেই, আপনার অঞ্চলে পুকুর ভরাট হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কিভাবে আন্দোলন গড়ে তুলবেন ও তার জন্য সমস্ত আইন ও উপায় বাতলানোর জন্য এই পুস্তিকা। এই পুস্তিকাটি আপনার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে মনে করি।

দেশভাগে বাস্তুহীন অগণিত মানুষের আশ্রয় কলোনী কেন্দ্রিক বসতি ও গত তিনদশকে পরিচিত ভূগোলের অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। চাকদহ পুরসভার ৯নং ওয়র্ডের বাসিন্দা পার্থ ও আরও অনেকে জলাশয় ভরাট হয়ে যাওয়া নিয়ে অভিযোগ করলেন। তাঁদের আরও অভিযোগ পরিষ্কার জলের উৎস তথা পুষ্করিণী বা জলাশয়ের সঙ্গে জলনিকাশী নর্দমাকে যুক্ত করার মতো কাজের বিরুদ্ধে। একই অভিযোগ শুনতে পাওয়া যাবে গড়িয়া, সোনারপুর, রাজপুর, হাবড়া, অশোকনগর, বারুইপুর, মহেশতলা, চাকদহ পুরসভার বিরুদ্ধে। এভাবেই জলনিকাশী ব্যবস্থার আশু সমাধানের পথ খুঁজে নিয়েছে রাজ্যের অসংখ্য পুরসভা এলাকার পরিচ্ছন্ন জলশয়, পুকুর। দিঘির সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছে নিকাশি নালা, নর্দমাকে। ফলে দ্রুত পরিচ্ছন্ন জলাশয়টি নোংরা জলের জলাশয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিছুদিন বাদে জেনে বা না জেনে কিছু মানুষ দাবি করতে শুরু করেছেন মশা, মাছি, নোংরা আবর্জনার ডাম্পিং জলাশয়টি বোজানো হোক। এভাবেই পুকুর বোজানোর আইনসম্মত রাস্তা তৈরি হচ্ছে। প্রশ্ন হল, পুকুর বোজানো বন্ধে আইন কি আছে? জলাশয় সংস্কার ও রক্ষাবেক্ষণের আইনটি কী? তার আগে একনজরে দেখে নিই পুকুর, জলাশয় সম্পর্কিত কিছু তথ্য।

পশ্চিমবঙ্গে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার হেক্টর পুকুর জতীয় বদ্ধ জলাশয় রয়েছে। ১ লক্ষ ৭২ হাজার হেক্টর নদী আছে। আর আছে ৮০ হাজার হেক্টর খাল, ৪২ হাজার হেক্টর বিল বাওড়। ১৭ হাজার হেক্টর রিজর্ভার ও ৫ হজার হেক্টর ময়লা জলের জলাভূমি।

-ঃ জলা ভূমি ভরাট রোধে সরকারী আইন ঃ-

পুকুর ভরাট রোধে বর্তমানে যে সরকরি আইন বর্তমান ***1) West Bengal Land Reforms Act, 1954/Sec. 4A/B/C/D. 2) West Bengal Central Inland Fisheries Act 1995 (Amdt.1992)***

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬ অনুযায়ী ৫ কাঠা বা তার বেশি আয়তনের কোনো পুকুর বা জলাশয় বা জলাভূমি ভরাট করা নিষিদ্ধ।

অনেক সময় পুকুর ভরাটকারীগণ পুকুরের পাড় বাঁধানোর নাম করে ১০ কাটার জলশয়ের চারপাশে মাটি ফেলে ৫ কাটার কম করে বন্ধ করে ফেলে এতে অনেক সময়ই প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মদত থাকে। আপনি সত্বর District Land & Land Reforms Officer এর নিকট ও Block Land & Land Reforms Officer কে অভিযোগ করুন। সাথে সাথে বিডিও পরিবেশ দপ্তরে অভিযোগ করুন। লোকাল পুলিশ স্টেশন ও থানাতে এই অভিযোগের কপি প্রদান করতে পারেন। অথবা পরিবেশ আদালতে Green Bench পুকুর ব জলাশয় বোজানোর বিরুদ্ধে মমলা রুজু করা যেতে পারে।

১) যে পুকুরটি বা জলাভূমিটি ভরাট হচ্ছে তা ৫ কাঠা (০,০৩৫ হেক্টর) বা তদুর্দ্ধ কী না।

২) ঐ জমিটির দাগ নম্বর, মৌজা নম্বর, কোন খতিয়ান এবং একটি আঞ্চলিক ম্যাপ বা ছবি করে অভিযোগ পত্রের সাথে জমা করতে হবে।

৩) খুব ভালো করে জানতে হবে ঐ জলাভূমিটি জলাশয় বলে রেকর্ড আছে কি না অথবা জলাভূমিটিকে শালিজমি বলে ভূমিদপ্তর থেকে জমির চরিত্র পাল্টে ফেলা হয়েছে কি না।

৪) জলাশয়ের পাড়ের জমি আউস জমি দেখিয়ে সেখানে ঘর নির্মাণ করে সমগ্র জমিটির চরিত্র পাল্টে ফেলা হয়েছে কি না।

-ঃ পুকুর নিয়ে আইন ঃ-

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই পুষ্করিণী সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু আইন ছিল। যেমন — ১) বেঙ্গল ওয়াটার হায়াসিন্থ অ্যাক্ট, ১৯৩৬ (বঙ্গীয় কচুরিপানা আইন)।

এরপর 7 পাতায়

জলা ভূমি সংরক্ষণ ও পুষ্করিণী উন্নয়ন 6 পাতার পর

এই আইন অনুযায়ী কচুরিপানা বা অন্য কোনও জলজ উদ্ভিদে পুকুর বুজে গেলে স্থানীয় পুরকর্তৃপক্ষওই পুকুরের মালিকের নামে নোটিশ জারি করতে পারবে। যদি মালিকের পুকুর পরিষ্কার করার আর্থিক সংস্থান না থাকে, তাহলে পুর কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার করে দেবে। *বেঙ্গল ট্যাঙ্ক ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট, (বঙ্গীয় পুষ্করিণী উন্নয়ন সাধন আইন) ও ওয়েস্ট বেঙ্গল রিকুইজিশন ইউটিলাইজেশন অ্যাক্ট, ১৯৫২ (পশ্চিমবঙ্গ সংরক্ষণ ও ব্যবহার আইন)* জল কর্তৃপক্ষকে বুজে যাওয়া পুকুর অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছে। এই ক্ষমতাগুলি পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে, ১৯৭৩-এ স্বীকৃত হয়েছে। *ট্যাঙ্ক অ্যাকুইজিশন অফ ইরিগেশন রাইটস, ১৯৭৬ (পুষ্করিণী অধিগ্রহণ ও সেচের অধিকার)* অনুযায়ী অনুরূপ ক্ষমতা স্বীকৃত।

২) *কলকাতা পুরসভা আইন, ১৯৮০,* বিভিন্ন ধারায় পুষ্করিণী সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। যেমন ৩০৯ ধারায় আছে পুকুরের ১৫ মিটারের মধ্যে বাড়ির পয়ঃপ্রণালী, মূত্রাগার বা অনুরূপ কোনও নোংরা নালার নির্মাণ নিষিদ্ধ। ৩৩৬ ধারায় জলের ধারার পাশে কোনও কঠিন বর্জ্য ফেলা নিষিদ্ধ। ৪৯৬ ধারায় কোনও পুকুর জনস্বাস্থ্যের হানি ঘটালে এই বুজিয়ে ফেলা এবং এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে। মশার জন্ম রোধ বন্ধ করতে বদ্ধ জল জমা রাখার বিরুদ্ধে নির্দেশ দেওয়া আছে।

৩) *পশ্চিমবঙ্গ পুরসভা আইন, ১৯৯৩*এর ৩৪০ ধারাকে কোনও সরকারি বা ব্যক্তিগত মালিকানধীন পুকুরকে পানীয় জলের উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা হলে সেখানে অন্য কোনও কাজ করা নিষিদ্ধ। একইভাবে কোনও পুকুর স্নানের জন্য নির্দিষ্ট হলে সেখনে কাপড় কাঁচা, বাসন মাজা, পশুদের স্নান করানো নিষিদ্ধ।

-ঃ জলাভূমি সংরক্ষণ ও মৎস্য চাষ আইন ঃ-

১) *দ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিজ অ্যাক্ট, ১৯৮৪ (নদী ও পুকুরে মৎস্য চাষের আইন)* আইনের উদ্দেশ্য হল মৎস্য চাষের সম্প্রসারণ। জলাশয় ন থাকলে মাছ চাষ হবে কোথায়? তাই বলা যায়, এই আইনটি পুকুর বোজানো রোধে সবচেয়ে ইতিবাচক। এই আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী কোনও পুকুর যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে বা যথাযথভাবে মৎস্য চাষ না হলে মৎস্য দপ্তর তার পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে পারে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (মৎস্য দপ্তরের জেলার ভারপ্রাপ্ত সহ-অধিকর্তা) জলাশয়টি 'নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন' কতৃত্ব ২৫ বছরের নিয়ে নিতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে উক্ত কর্তৃপক্ষ মাছ চাষের জন্য কোনও রেজিস্টার্ড সংস্থা ও গোষ্ঠীকে ইজারা দিতে পারবে (এই অংশটি সংশোধন করে শুধু মাত্র মৎস্যজীবী সমবায়কে দেওয়া যাবে বলা হয়েছে)।

২) বর্তমান সময়ে সবচেয়ে কার্যকরী আইন হল, *'দ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ডফিশারিজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৯৩ (নদী ও পুকুরে মৎস্য চাষের সংশোধিত আইন)'*। সংশোধিত আইনে যে কোনও পুষ্করিণীকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার (যথা বুজিয়ে গৃহ নির্মাণ) নিষিদ্ধকরা হয়েছে। সংযোজিত আইনের ১৭ (ক) ধারা অনুযায়ী (ক) পুকুর পাড় সহ ৫ কাটা অর্থাৎ ০,০৩৫ হেক্টর বা তার বেশি মাপের কোনও 'শ্রেণিভুক্ত পুকুর' ডোবা, জলাশয় ভরাট করা যাবে না। (খ) ' রেকর্ডভুক্ত' পুকুর, ডোবা না হয়ে স্থানটি যদি কেবলমাত্র নিচু জমিও হয় এবং বছরের ৬ মাসের অধিক সময় 'জলধারণ' করে থাকে তবে সেই জমিও ভরাট করা যাবে না। (গ) মৎস্য তবে সেই জমিও ভরাট করা যাবে না। (গ) মৎস্য চাষ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কোনও পুকুর বা জলা জায়গাকে বিভজন করে ৫ কাটা বা ০,০৩৫ হেক্টরের কম করা যাবে না বা অন্য কোনও ব্যক্তির নামে হস্তান্তর করা যাবে না। (ঘ) কোনও বড় জলাশয়কে কৃত্রিমভাবে বাঁধ দিয়ে ৫ কাঠা বা তার চেয়ে ছোট জলায় পরিণত করা নিষিদ্ধ। (ঙ) জলাশয়টি কেবলমাত্র মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে—অন্য কোনওভাবে নয়। (চ) আইন লঙ্ঘিত হলে সংশ্লিষ্ট পুকুরের পরিচালনভার মৎস্য দপ্তর অধিগ্রহণ করতে পারে। (ছ) বুজিয়ে ফেলা বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে দায়ী ব্যক্তিকেই পুকুরটিকে আবার আগের চেহরায় ফিরিয়ে দিতে হবে। (জ) এই আইনের ধারাগুলি লঙঘন করলে 'জামিন অযোগ্য অপরাধ' বলে গণ্য করে দোষী ব্যক্তি / ব্যক্তিগণকে শাস্তিস্বরূপ জেল / জরিমানা করার কথা বলা হয়েছে।

৩) *জল (দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ) আইন ১৯৭৪*। ২৪ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মানের না হলে জলে কোনও বর্জ্য ফেলা যাবে না। ৪১ ধারা অনুযায়ী দোষী ব্যক্তির ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডহতে পারে।

সংযোজন

বিধানসভার মৎস্য দপ্তরের বাজেট বক্তৃতায় মৎস্য মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে মোট ২ লক্ষ ১১ হাজার ২৩৭ হেক্টর জলাশয়ে মাছ চাষ হয়। এর একাংশ হল খাস জলা, যা নিলামের মাধ্যমে আর অন্যের হাতে দেওয়া হবে না। খাস জলা দখল আটকাতে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করা হয়েছে। সমস্ত খাসজলা থাকবে মৎস্যজীবী সমবায়ের হাতে। যেখানে এখন সমবায় নেই সেখানে নতুন সমবায় গড়ে তুলে মৎস্যজীবী গোষ্ঠীর হতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে।

তথ্য সহায়তা — তথ্য দপ্তর ঃ পুকুর — বসুন্ধরা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত প্রতিবেদন। ২২ শে অক্টোবর ২০১০

মানুষের অধিকার চলমান সংগ্রাম — নাগরিক মঞ্চ।

আমাদের আবেদন, চারিদিকে যেভাবে প্রকৃতি বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের বাঁচা দায় হয়ে উঠবে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে ওয়াটার এ টি এম তৈরি হয়ে গিয়েছে। ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকার কার্ড কিনে তা পাঞ্চ করলে তবেই জল পাওয়া যাবে। বহুজাতিক কোম্পানিরা রাস্তায় নেমে পড়েছেন। আপনার আয়ের ৩০ শতাংশ দিয়ে যাতে জল কিনতে হয় তার ব্যবস্থা হচ্ছে। তা হলে জল যদি আয়ের ৩০ শতাংশ দিয়ে কিনতে হয় তবে ওষুধ কিনতে হবে আরো ৩০ শতাংশ দিয়ে তবে ৪০ শতাংশ টাকা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া, জামা-প্যান্ট, বসবাস হবে তো? তাই এলাকায় এলাকায় এই জলাভূমি বোজানোর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন।

সৌজন্যে ঃ- চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা।

যোগাযোগ ঃ-৯৩৩২২৮৩৩৫৬ / ৯৬৮১৯১৬৮৬৪ / ৯৭৪৯৪৮৬৬৪৯

৫ জুন, ২০১৪ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাটির সংক্ষিপ্তাকারে ছাপা হল। পুস্তিকাটি চাকদহ পৌরসভার পৌরপিতা বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে (চাকদহ থানার মোড়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করেন চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা) প্রকাশ করেন। — বিজ্ঞান অন্বেষক।

পানীয় জলের গুণাগুণ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)আন্তর্জাতিক স্তরে নিম্নলিখিত ভাবে পানীয় জলের গুণাগুণ নির্দিষ্ট করেছেন। ক) বর্ণহীন, স্বচ্ছ, গন্ধমুক্ত, pH6.5 থেকে 7.5 ক্ষারতা সর্বোচ্চ600 p.p.m., লোহা 1 p.p.m., কোরাইড 1000 p.p.m., কলিফর্ম টোটাল কাউন্টপ্রতি 100 মিলি মিটারে সর্বোচ্চ10। খ) দ্রবীভূত কঠিন পদর্থ (সর্বোচ্চ).ক্যালসিয়াম 200 p.p.m. ম্যাগনেসিয়াম 30 p.p.m. জিঙ্ক 15 p.p.m., কপার 1.5 p.p.m., ম্যাঙ্গানিজ 0.3 p.p.m., অ্যালুমিনিয়াম 0.2 p.p.m. (ক্রোমিয়াম, সীসা, আর্সেনিক, ক্যাড্‌মিয়াম 0.01 p.p.m.), পারদ 0.001 p.p.m., সালফেট, নাইট্রেট, ক্লোরাইড যথাক্রমে 400.45 এবং 10 p.p.m.। সায়ানাইড, খনিজ তেল ও ফেনল জাতীয় পদার্থ না থাকাই কাম্য। গ) ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য মুক্ত কোরিন 0.5 মিগ্রা/লিটার থাকতে পারে। ঘ) নিরাপদ পানীয় জলে মোট কলিফর্ম কাউন্ট০ হবে।

বিঃদ্রঃ- 1 p.p.m. (পিপিএম) =1 লিটার 1 মিগ্রা।

মাটির তলার জল

5 পাতার পর

থেকে বোঝা সম্ভব। এর মধ্যে সারা ভারতবর্ষে জল তুলে বোতল বন্দি করার কারখানাগুলোর সাথে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে বিপুল সংঘর্ষ তৈরী হচ্ছে। কেরালায় কোকোকোলা কোম্পানীর সাথে স্থানীয় কৃষকদের লড়াই-এর কথা আমাদের জানা। প্রচুর মাটির তলার জল তুলে ফেলায় আর্সেনিক থেকে আর্সেনোকোসিস্ রোগ ও ফ্লোরাইড থেকে দাঁত, নোখ ও হাড়ের ক্ষয় হচ্ছে। শেষে মারা যাচ্ছেন ক্যানসারের মত মারণ রোগে। বর্ধমান ও দুর্গাপুর অঞ্চলে জলস্তর নেমে যাওয়ায় বড় বড় বাড়ির দেওয়ালে ও ছাদে ফাটল দেখা যাচ্ছে।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা আতঙ্কিত এই জল লুটের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে। সরকার, পৌরসভা, পঞ্চায়েতের কর্তা ব্যক্তিগণ এব্যাপারে এখনও যদি সজাগ না হন তবে জলাভাবে বলিভিয়ার মত এদেশেও জলযুদ্ধ স্বাভাবিক। শুধু আইন করে হবে না। সমস্যাটা বোঝাতে হবে তৃণমূল স্তরের মানুষদের। যেসব বৃহৎ জল কারবারি যারা জল লুটে ব্যস্ত তাদের বিরুদ্ধেও জনমত গঠন করতে হবে। বৃষ্টির জল ধরে তাকে কিভাবে বহুমুখী ব্যবহার করা সম্ভব তার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। আমরা চাই বিজ্ঞানসম্মত কর্মোদ্যোগ। তবে বাঁচব আমরা, বাঁচবে পৃথিবী আর পরবর্তী প্রজন্ম।

— লেখকঃ বিবর্তন ভট্টাচার্য (বিজ্ঞানকর্মী)

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, মোঃ- ৯৩৩২২৮৩৩৫৬

পানীয় জল নষ্ট হচ্ছে

শিল্প কারখানা থেকে নির্গত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থগুলি নদী নালা-খালের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাশয়ের মাধ্যমে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে বহুদেশেই পানীয় জলের সংকট ঘনিয়ে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যের বহুদেশই মেরু অঞ্চলের বরফ কেটে জাহাজে করে নিয়ে আসার কথা ভাবছে।

পেট্রোলিয়াম তেল বা তৈলজাত পদার্থ যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায় তখন ব্যাপক পরিমাণে ঐ তেল সমুদ্রের জলের সঙ্গে মেশে। ভাসমান তেলের জন্য সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের হার কমে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্রের জীবকূলের মধ্যে নষ্ট হচ্ছে পারিবেশিক ভারসাম্য। এছাড়াও সমুদ্রের জলে প্রতিনিয়ত শিল্পজাত দূষিত পদার্থ মিশছে। সামগ্রিকভবে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য।

দূষিত জলের ব্যবহারে স্বাস্থ্যের ক্ষতি ঃ প্রতিনিয়ত দূষিত জল ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর বেশ কয়েক'শ লক্ষমানুষ ও গবাদি পশু অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কলেরা, টাইফয়েড, ডায়ারিয়া, কৃমি প্রভৃতি রোগে এক বিলিয়ন এর বেশী (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ , ১ বিলিয়ন = ১০০ মিলিয়ন) লোক মারা যায়। শুধুমাত্র ডায়রিয়াতে প্রতি বছর ৯০০ মিলিয়ন এর বেশী মানুষ আক্রান্ত হন। গঙ্গার জলে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় (শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ ও জলের তপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য) মাঝে মাঝেই মাছ দূষিত জলের দ্বরা রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং সেই মাছ খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের ফলে নানারকম রোগ দেখা দেয়। কৃষিতে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জল দূষিত হয়, সেই জল গরু পান করার ফলে দুধের মধ্যে কীটনাশক পাওয়া যাচ্ছে। ফলে মানুষের রোগ-ব্যাধি বেড়েই চলেছে।

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে ১) জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে। ২) নদী, নালা, খাল ও বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। ৩) অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। ৪) ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধিপাচ্ছে।

বিকল্প ভাবনা ঃ ১) নদীর গভীরতা বৃদ্ধি, মজা নদী ও জলাশয় পুনরুদ্ধার, জলভূমি সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার সহ নদীর পার্শ্ববর্তী দু'ধারে বড় বড় গাছ লাগানো প্রয়োজন। ২) শিল্পের আবর্জনা নদী জলশয়ে ফেলা বন্ধকরা দরকার, সেই সঙ্গে সামুদ্রিক জলে তেল দূষণরোধ করা দরকার। ৩) জলের বিভিন্ন উৎসগুলিকে নির্দিষ্ট ভাবে ব্যবহারের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা দরকার। ৪) খরা প্রবণ এলাকাগুলিতে ভূ-গর্ভস্থ জল সম্পদকে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা এবং বৃক্ষরোপণ ও বনধ্বল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ৫) ছোট ছোট জলাধার তৈরী করে বর্ষাকালের অতিরিক্ত জল ধরে রাখা দরকার।

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩

সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)

E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in
bijnandarbar1980@gmail.com